আধুনিক পদ্ধতিতে রপ্তানিযোগ্য কুচিয়া (Eel Fish) চাষ ব্যবস্থাপনা ও সম্ভাবনা

Implemented by

swisscontact

Funded by

UKaid

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

DANIDA

প্রশিক্ষণ মডিউল

আধুনিক প্রযুক্তিতে কুচিয়া (Eel Fish)

চাষ ব্যবস্থাপনা ও সম্ভাবনা

মডিউল প্রণয়ন

ড. বিনয় কুমার চক্রবর্তী

প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প

মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা

সহযোগিতায় :

হাছান উজ জামান

হেড অব অপারেশন

চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

প্রকাশনায় :

চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি. ও ক্যাটালিস্ট

প্রকাশকাল :

জুলাই ২০১৭

মুদ্রণে :

দি এ্যাড কমিউনিকেশন

৬৫, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম

✆ ০৩১-৬১১৭১১, ২৮৫৪৪৪৯

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড় ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ জলাশয়সহ আমাদের রয়েছে বিশাল সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক পরিত্যক্ত ভূমি ও জলাশয় প্রাকৃতিকভাবে কুচিয়া (Eel Fish) উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান। বর্তমানে চীন, জাপানসহ আন্তর্জাতিক বাজারে-এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

দেশের আদিবাসী জনগণের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের অন্যতম পন্থা হচ্ছে কুচিয়া শিকার। এটির চাষপদ্ধতি, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস, প্রজনন কৌশল, আহরণসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা সহজতর নয় এবং প্রকৃতি থেকে আহরণপদ্ধতিও জটিল। ঔষধি ও পুষ্টিগুণ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বাজারে-এর প্রচুর চাহিদা থাকায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ-লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, বিভিন্ন দাতা-সংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এগিয়ে আসলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন খাত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উন্নতপদ্ধতি অনুসরণ, বাণিজ্যিক-চাষে কারিগরি সহায়তা ও Technology Transfer-এর লক্ষ্যে দাতা-সংস্থা Katalyst ও Chittagong Meridian Agro Industries Limited-এর যৌথ উদ্যোগে চাষ নির্দেশিকা প্রকাশ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা এই প্রজাতি সংরক্ষণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও রপ্তানীপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের সুযোগ রয়েছে।

কোহিনুর কামাল
চেয়ারপার্সন
মেরিজিয়ান গ্রুপ

FOREWORD

Agribusiness for Trade Competitiveness Project (ATC-P), branded as Katalyst, is a pioneer market systems development project contributing to sustainable poverty reduction in Bangladesh. It is implemented by Swisscontact under the umbrella of the Ministry of Commerce, Government of Bangladesh. The project has been operating in Bangladesh since 2003 in three phases. The current phase (March 2014 - March 2018) is co-funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), the UK Government, and the Danish International Development Agency (Danida).

Fish is an important part of the balanced diet in Bangladesh. It plays a significant role as protein supplier for the country's poor households as it is relatively inexpensive to cultivate and to purchase.

Bangladesh has become a global player in aquaculture production as the fourth largest producer in the world. In order to meet the sustained growth of fish in Bangladesh, Katalyst has been working in farmed fish sector since 2004. In spite of a phenomenal growth in production of fish in Bangladesh over the past decade, the demand of fish still outstrips the supply.

In Bangladesh, the main barrier to faster growth of aquaculture production is the lack of good quality hatcheryproduced fish seeds. Considering importance of cultured fisheries, the government of Bangladesh has given emphasis on large scale hatchery production of fish seed, nursery and rearing of indigenous fish varieties. Among the presently practiced (sporadic scale), the few of the profitable species are Shing (Heteropneustes fossilis), magur (Clarias batrachus), pabda (Ompok bimaculatus), shol (Channa striata) eel fish (Anguilliformes) and Gulsha (Mystus cavasius).

I am very happy to acknowledge this training manual developed by our project's partner, Meridian Agro Industries Limited. The manual will help Meridian to offer quality training to its staff, fish farmers and the hatchery owners.

The training manual has been developed by experts with diverse knowledge on aquaculture. The manual contains information for hatcheries, nurseries and fish farmers. At the hatchery level, information on improved brood management, rearing for quality fingerling production of the selected species are provided along with farmer level information on improved production and post-production.

I want to thank Chittagong Meridian Agro Limited for publishing this training manual to promote improved techniques to culture selected catfish and snake head species that intends to increase income of producer and enhance business opportunity for the hatcheries.

GB Banjara
General Manager
Katalyst

বাংলাদেশে কুচিয়া চাষের পটভূমি

কুচিয়া একটি ইল (Eel) জাতীয় মাছ যা বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জলাশয়ে উৎপাদিত হয়ে থাকে। দেহের আকৃতি ও গর্তে বাস করার স্বভাব এবং সাপের মত দেখতে হওয়ার জন্য দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা কম হলেও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অংশের নিকট মজাদার খাবার হিসেবে জনপ্রিয়। স্বল্প জনগোষ্ঠীর নিকট-এ মাছের চাহিদা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পরিমাণের ওপরই নির্ভরশলি ছিল। পুষ্টিগুণে উঁচুমানের এ মাছের চাহিদা দেশে কম থাকলেও বিদেশে বেশি থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বিষয়টি সামনে রেখে এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও কুচিয়ার এই প্রজাতি পাকিস্তান, নেপাল, মায়ানমার ও ভারতে পাওয়া যায়। সিলেট, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলাসহ দেশের সর্বত্র কম গভীরতাযুক্ত বিল ও বোরো ধান খেতের আইলে, জলজ আগাছার ঝোঁপ-ঝাঁড়ে পরিপূর্ণ পরিবেশে কুচিয়া পাওয়া যেত। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রকৃতি থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কুচিয়া সংগ্রহের ফলে বর্তমানে এর প্রাপ্যতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। কুচিয়া আজ বিপন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত (IUCN 2000)। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিকারিরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুচিয়া শিকার করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আহরিত কুচিয়া মাছ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। আদিবাসী সমাজ ছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই কুচিয়া খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। খাদ্য হিসাবে কুচিয়া অতি উঁচু মানের। এতে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে এবং খেতে সু-স্বাদু ও ঔষধি গুণসম্পন্ন। উচ্চ রক্তচাপ কমাতে, হজমশক্তি বাড়াতে, শ্বাসকষ্ট দূর করতে ও ব্যথানাশক হিসেবে এটি কাজ করে। দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণ, কুচিয়ার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং এর চাষ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

খাদ্য হিসেবে কুচিয়া :

কুচিয়া মাছকে নিম্নোক্ত কারণে ঔষধি মাছ হিসাবে গণ্য করা যায় :

১। কুচিয়া মাছ ব্যথা-বেদনানাশক হিসেবে কাজ করে।

২। কুচিয়া মাছ মানব শরীরে রক্ত উৎপাদনে সাহায্য করে।

৩। কুচিয়া মাছ হজমশক্তি বাড়ায়।

৪। কুচিয়া মাছ উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

৫। কুচিয়া মাছ শ্বাসকষ্ট দূরীকরণে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক ছোট পুকুর ও জলাশয় (ধানখেত) রয়েছে। যা আজও মৎস্য চাষের আওতায় আসেনি। এ-সমস্ত জলাভূমিতে যথাক্রমে চাষ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে কুচিয়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা জরুরি। এ ধরনের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব। আদিবাসী সমাজ ছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই কুচিয়া খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। দেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে-এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কুচিয়ার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং এর চাষ ব্যবস্থাপনা একটি সফল পদক্ষেপ।

শ্রেণিবিন্যাস (Classification)

Phylum- Chordata
Class- Actinopterygii
Order- Synbranchiformes
Family- Synbranchidae
Genus- Monopterus
Species- *M. cuchia*

কুচিয়া চাষে বিশ্ব সম্প্রদায় :

বাংলাদেশে কুচিয়া চাষ নতুন হলেও এশিয়ার কিছু দেশ যেমন : চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনামে-এর প্রচলন বেশ প্রাচীন। এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশ কুচিয়া চাষের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। স্বল্পসময়ের ব্যবধানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতামূলকভাবে কুচিয়া চাষে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এদের অধিকাংশই কুচিয়া চাষ করে মূলত আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাণিজ্যে ও নিজেদের চাহিদা মিটানোর জন্য।

কুচিয়া চাষে বাংলাদেশ :

বাণিজ্যিকভাবে কুচিয়া উৎপাদনকে বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরীক্ষামূলকভাবে খাঁচায় কুচিয়া মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সীমিত পরিসরের এ-কার্যক্রম সময়ে সময়ে পরিচালিত হয় মূলত গবেষণা ও স্নাতকের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে।

২০০৬-০৭ সালে মৎস্য অধিদপ্তর ও World Fish Center-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতিতে প্রাকৃতিক জলজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে কুচিয়া চাষ শুরু হয়।

কুচিয়ার পোনার অভাব :

এখন পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননের কোনো রেকর্ড বাংলাদেশে নেই। তবে যেহেতু কুচিয়া মাছের ডিমের সংখ্যা খুবই কম; সেহেতু কৃত্রিম প্রজননে পোনার যে প্রাপ্তি পাওয়া যাবে তা দিয়ে চাষের পোনার প্রাপ্যতা মিটানো সম্ভব নয়। প্রকৃতি থেকে পোনা সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই, প্রাকৃতিক প্রজননের উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রাকৃতিক প্রজনন কীভাবে সহজতর করা যায় সে ব্যাপারে গুরুত্ব-আরোপ করতে হবে।

কুচিয়া চাষে উপযোগী খাদ্যের অভাব :

বাংলাদেশে যেহেতু কুচিয়া মাছ চাষের প্রচলন নেই সেহেতু এর খাবারের উপর তেমন কোনো তথ্য নেই। কুচিয়া মাছের চাষ পদ্ধতি ও তার খাদ্যাভ্যাসের সাথে তাল মিলিয়ে উপযোগী সম্পূরক খাবার তৈরি করতে হবে। তবে উক্ত পিলেট বা সাধারণ খাবারে অবশ্যই ৪০% আমিষের পরিমাণ থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় কারিগরি দিকনির্দেশনার অভাব :

আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সীমাবদ্ধতার মাঝেও যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করা হয়েছে তা চাহিদার তুলনায় ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে কুচিয়া চাষ পদ্ধতির অনেক উন্নতি সাধন করেছে। স্বাদুপানিতে খাঁচায় ও ধানখেতে চাষ করা হচ্ছে; সেখানে আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে কুচিয়া চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ উপযোগী চাষ পদ্ধতি ও যথাযথ কারিগরি দিকনির্দেশনার অভাবে কুচিয়া চাষ জনপ্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়েছিলো। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য দু'একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় তেমন উল্লেখযোগ্য ফলাফল লাভ না করাতে এদেশে দীর্ঘদিন কুচিয়া চাষে আর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বাংলাদেশে কুচিয়ার প্রাকৃতিক প্রজনন :

প্রকৃতি থেকে কুচিয়া আহরণ কষ্টসাধ্য। আদিবাসী এলাকায় অনেক ছোট পুকুর ও জলাশয় (ধানখেত) রয়েছে যা আজও মৎস্য চাষের আওতায় আসেনি। এ-সমস্ত জলাশয়ে চাষ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে কুচিয়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বাংলাদেশে কুচিয়া চাষ নতুন হলেও এশিয়ার কিছু দেশ যেমন : চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনামে-এর প্রচলন বেশ প্রাচীন। এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশ কুচিয়া চাষের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। স্বল্প-সময়ের ব্যবধানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতামূলকভাবে কুচিয়া চাষে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এদের অধিকাংশই কুচিয়া চাষ করে মূলত : আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ও নিজেদের চাহিদা মিটানোর জন্য।

কুচিয়ার চাষ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য এর আবাসস্থল, খাদ্যাভ্যাস, প্রজনন কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে জানা দরকার। কুচিয়া পানির অগভীর অংশে মাটির গর্তে জলজ আগাছাযুক্ত জলাভূমিতে বাস করে। এরা দিনেরবেলা গর্তে বা আগাছা অন্যকিছুর আড়ালে লুকিয়ে থাকে। কুচিয়ার অতিরিক্ত শ্বসনতন্ত্র থাকায় পানি বা খাদ্যের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে আর্দ্র-মাটিতে গর্ত করে টিকে থাকতে পারে। তাছাড়া কম্পোস্ট হিপ, বাঁশের মোড়া, ঝোপ-ঝাঁড় দিয়ে তৈরি আবাসস্থলে কুচিয়া বসবাস করে।

কুচিয়া নিশাচর প্রাণী। রাতে খাবার খেতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। কুচিয়া রাক্ষুসে স্বভাবের, প্রাণীজ খাবার খেতে পছন্দ করে। এদের খাদ্য তালিকায় ছোট মাছ, মাছের পোনা, গুতুম মাছ, কেঁচো, শামুক, সিল্ক ওয়ার্ম পিউপি, জলজ কীটপতঙ্গ ইত্যাদি রয়েছে। কুচিয়ার বৃদ্ধিহার সন্তোষজনক। জীবিত পোনা মাছ, শুটকি মাছের গুড়া, শামুক ও ঝিনুকের মাংস খেতে ভালোবাসে। কুচিয়া মাছকে প্রতিদিন শারীরিক ওজনের ৩-৫% খাবার দিতে হয়। পানিযুক্ত ধানখেত থেকে গোল্ডেন এ্যাপল শামুক সংগ্রহ করে কুচিয়ার খাবার হিসেবে দেয়া যেতে পারে। কুচিয়া মাছের খাবার সরবরাহ নির্ভর করে মাছের মোট ওজন ও তাপমাত্রার ওপর। খাবার ট্রেতে করে সাজিয়ে দিতে হয়। ট্রেটি কাঁদার উপর পানির নিচে রাখতে হবে। খাবার পরিবেশন এমনভাবে করা উচিত যেন কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত খাবার পানির পরিবেশ দূষিত করতে না পারে।

চাষে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা কুচিয়ার পোনাপ্রাপ্তি। কুচিয়া চাষ প্রচলনে অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সময়মত চাষযোগ্য আকারের পোনাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। এজন্য কুচিয়ার পোনার উৎস সম্পর্কে জানতে হবে। চাহিদা অনুযায়ী পোনাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে কুচিয়ার প্রজনন সম্পর্কে জানা জরুরি।

কুচিয়া প্রাকৃতিকভাবে তার আবাসস্থলে প্রজনন করে থাকে। চৈত্রের শেষ থেকে আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এরা প্রজনন করে। সাধারণত পুরুষ কুচিয়া, স্ত্রী কুচিয়া অপেক্ষা আকারে বড় হয়। এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে কুচিয়ার গোনাডোসোমাটিক ইনডেক্স সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে যা থেকে ধারণা করা যায় যে, কুচিয়া বছরে একবার মাত্র প্রজনন করে থাকে। প্রজননের সময় এরা পানির উপরিতলের কাছাকাছি তলদেশের মাটিতে বিশেষভাবে ডিম পাড়ার উপযোগী বাসা তৈরি করে। এরূপ তৈরি বিশেষ বাসায় কুচিয়া ডিম দেয় এবং স্ত্রী কুচিয়া সার্বক্ষণিকভাবে বাচ্চাদের পাহাড়া দেয়।

কুচিয়া মাছের প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য স্থান নির্বাচন

কুচিয়ার সফল প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খামারে প্রজনন স্থান নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন স্থানটি খামারের উঁচু জায়গায় হয়। নিম্নে স্থান নির্বাচনের বিষয়গুলি বর্ণনা করা হলো :

স্থান নির্বাচন : খামারের উঁচু সমতলভূমি

ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর নির্মাণ : নির্বাচিত জায়গায় একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর (ডিচ) নির্মাণ করতে হবে। ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) আয়তন ৩০ ফুটx১২ ফুটx৩.৫ ফুট আকারের হবে। ৩৬০ বর্গফুট আকারের পুকুরে ১ ফুট গভীর করে মাটি কাটতে হবে। ১ ফুট মাটি কাটার পর তার চারিপাশে ২ ফুট বকচর/কুলপার রাখতে হবে। তারপর ২৬x৮ বর্গফুট আয়তনে ডিচের ভিতর আরও ২.৫ ফুট খনন করতে হবে। খননের পর প্রথমে ডিচের তলায় পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে। পলিথিনের উপর ত্রিপল বিছাতে হবে।

মাটিতে নিচের ত্রিপলের উপর ১ম স্তরে ৬ ইঞ্চি পুরুত্বে ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে তলদেশে বিছিয়ে দিতে হবে।

২য় স্তরে ৩.০ কেজি ইউরিয়া, ৬.০ কেজি টিএসপি, ৬.০ কেজি চুন, ৬০ কেজি গোবর, প্রয়োজনীয় পরিমাণ কচুরিপানা ও খড়/বিচালী দিয়ে স্তরে স্তরে সাজিয়ে ৫ ইঞ্চি কম্পোস্ট পুরুত্বের স্তর তৈরি করতে হবে।

৩য় স্তরে ০৫-০৭ দিনের শুকনো কলাপাতা দিয়ে ০১ ইঞ্চি পুরু করে ঢেকে দিতে হবে।

সর্বশেষ ৪র্থ স্তরটি ৬ ইঞ্চি পুরু হবে এবং এ স্তরটি ১ম স্তরের মত ৮০% এটেঁল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে।

ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) ভিতরের চারদিকে বেড়া-সংলগ্ন কুলপাড়/বকচরটি ১ ফুট পর্যন্ত চওড়া ও ১ ফুট গভীরতায় ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে।

ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) ভিতরের চারদিকে বেড়া-সংলগ্ন কুলপাড়/বকচরটি ১ ফুট পর্যন্ত চওড়া ও ১ ফুট গভীরতায় ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি মিশিয়ে সমতল ভূমির সমান স্তরে ভরাট করে দিতে হবে। পুরো বকচরটি নারিকেল গাছের পাতা ও দূর্বাঘাস দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কারণ বকচরটিতে যেন সূর্যের আলো না পরে এবং কুচিয়া মাছ তার আবাসস্থল হিসাবে বকচরটি নিরাপদ মনে করে। তবে মনে রাখতে হবে বকচর ও বাহিরের পাড় যেন সমানে সমান থাকে। বৃষ্টিজনিত কারণে বাইরের দিকটি কিছুটা উঁচু ঢাল করে দিতে হবে যেন বৃষ্টির পানি না জমতে পারে।

৩০ ফুট/১২ ফুট সাইজের ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের বাইরের দিকে বাঁশের শক্ত খুঁটি পুতে বাঁশের ফারি দিয়ে মজবুত করে ২ থেকে ২.৫ ফুট উঁচু বেড়া দিতে হবে। বেড়াটি এমনভাবে দিতে হবে যেন ৩ থেকে ৪ বছর এর স্থায়িত্ব থাকে।

আবাসস্থল তৈরি

আবাসস্থল তৈরিতে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে-

নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং তাপমাত্রা রোধ করার জন্য বকচর/কূলপাড়ের উপর নারিকেল গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে;

কূলপাড়টি পানির স্তর থেকে সবসময় বেশি উচ্চতায় থাকবে।

পানির স্তর নিচে নেমে গেলে পানি সরবরাহ করতে হবে।

প্রকৃতিতে কুচিয়ার আবাসস্থর ধানখেতের মত ডিচের পরিবেশ উপযোগী করতে হবে।

কুচিয়া অবমুক্তির পূর্বে ডিচে আশ্রয়স্থল হিসেবে জলজ আগাছা ও কচুরিপানা দিতে হবে।

উল্লিখিত আকারের ডিচে ২০০-৪০০ গ্রাম ওজনের ৪০০ টি কুচিয়া (পুরুষ : স্ত্রী : ১:১) ছাড়তে হবে।

ডিচের কূলপাড়ে এরা গর্ত করবে।

পরবর্তীতে এরা গর্তে বসবাস করে ও ডিম দেয়।

কুচিয়ার স্ত্রী-পুরুষ শনাক্তকরণ

পুরুষ ও স্ত্রী কুচিয়া শনাক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু কিছু কিছু বাহ্যিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য এদেরকে পৃথক করতে সহায়তা করে। এটা সুনিশ্চিত যে, পরিপক্ব পুরুষ কুচিয়া স্ত্রী কুচিয়া অপেক্ষা আকারে বড় হয়। স্ত্রী কুচিয়ার দেহের তলদেশ (Abdomen) ফুলে থাকে এবং হলদে-বাদামি রং ধারণ করে। দেহের তলদেশের চামড়া খসখসে হয় এবং পায়ুপথ ও জনন ছিদ্রপথ গোলাকার হয়। পুরুষ কুচিয়ার জনন ছিদ্রপথ নলাকার হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণভাবে স্ত্রী-পুরুষ উভয় কুচিয়ার একটি মাত্র সাদা, মসৃণ সুচাকৃতির গোনাড থাকে। গোনাডটি লম্বালম্বিভাবে পৌষ্টিক নালীর নিচে এবং কিডনির উপরে তলপেটের গহ্বরের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে থাকে। পুরুষ কুচিয়া মাছে লিভার থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত দুইটি সমান সরু ও পাতলা লম্বাকৃতির স্পার্ম ডাক্ট দেখা যায়। স্ত্রী কুচিয়ার ক্ষেত্রে একটি নলাকার ওভাডাক্ট গলবাডারের সম্মুখভাগ থেকে শুরু হয়ে পায়ুপথে উন্মুক্ত হতে দেখা যায়। সফল প্রজননের জন্য পরিপক্বতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্ত্রী কুচিয়ার ক্ষেত্রে হালকা চাপ দিয়ে হলুদ রংয়ের তরল এবং স্বল্পসংখ্যক ডিমও বের হয় যা পরিপক্বতার নির্দেশক। অন্যদিকে পরিপক্ব পুরুষ কুচিয়ার ক্ষেত্রে তলপেটে হালকা চাপে তরল সাদা মিল্ট বের হয়। এসময় স্ত্রী মাছের জেনিটাল প্যাপিলা গোলাকৃতি স্ত্রী ও পুরুষ কুচিয়ার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো :

শনাক্তযোগ্য অংশ	পুরুষ	স্ত্রী
পেট	গোলাকার, অপেক্ষাকৃত শক্ত।	নরম ও গোলাকার
পায়ুপথ	সামান্য লম্বা ও লালচে বর্ণের	পায়ু পথ স্ফীত, গোলাকার, মাংসল ও গোলাপী
লেজ	ছোট	চেপ্টা
রঙ	শরীরের রং উজ্জ্বল ও বাদামি	শরীরের রং তুলনামূলক ফ্যাকাশে

ময়না উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

এখন পর্যন্ত কুচিয়া মাছের সম্পূরক পিলেট খাবার ব্যবহার করা হয়নি। কারণ কুচিয়া মাছের জন্য ৪০% আমিষযুক্ত খাবারের দরকার হয়। কুচিয়া চাষ পদ্ধতি এখন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়নি সেজন্য সম্পূরক খাবারে কুচিয়া মাছকে অভ্যস্ত করানো হয়নি। তাই কুচিয়া মাছের নার্সারি খাবার হিসেবে পুকুরে উৎপাদিত জুওপ্লাংকটন ময়না খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ ময়না এদের প্রিয় খাদ্য। ময়না উৎপাদনের করণীয়সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

ময়না উৎপাদনের জন্য ১৫-২০ শতাংশ আয়তন বিশিষ্ট একটি ছোট্ট পুকুর নির্বাচন করতে হবে।

পুকুরটি যথারীতি শুকাতে হবে।

পুকুরের পাড় যথারীতি মেরামত করতে হবে।

শতাংশে ২৫০ গ্রাম ইস্ট (Yeast) ও ১০০ গ্রাম চিটাগুড় ব্যবহার করতে হবে।

শতাংশে ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম ইউরিয়া পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৩-৪ দিনের মধ্যে হালকা হলুদাভ পানির বর্ণ ধারণ করবে এবং ময়নার আধিক্যতায় প্লাংকটন জন্মলাভ করবে।

প্লাংকটন নেট দিয়ে তা সংগ্রহ করে কুচিয়ার পোনাকে খাওয়াতে হবে।

কুচিয়া মাছ চাষের পদ্ধতি :

আমাদের দেশে কুচিয়ার উৎপাদন এখনও প্রাকৃতিক উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি প্রয়োগের সুযোগ কম। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি হলো চাষ। তাই কুচিয়ার চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ আজ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দু'পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

১. একুয়াকালচার পদ্ধতি ও

২. প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

একুয়াকালচার পদ্ধতি

একুয়াকালচার পদ্ধতির মধ্যে ডিচে চাষ পদ্ধতি উপযোগী বলে বিবেচিত। মনে রাখতে হবে যে, বালি, ইট ও সিমেন্ট জাতীয় উপকরণে তৈরি চৌবাচ্চা স্বভাবজনিত কারণে এরা সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে পুকুরে মাছের পোনা ছাড়লে কমবেশি পোনা হবে। কিন্তু পুকুরে কুচিয়া ছাড়লে কুচিয়া পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এর বাসস্থান তার প্রাকৃতিক বাসস্থানের মত না হয়। পুকুর থেকে গর্ত করে বা পাড়ের উপর দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কুচিয়ার অধিক। তাই, অধিক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষ করার জন্য মাটির তৈরি ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর (ডিচ) অধিক নিরাপদ বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

কুচিয়া চাষে ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর (ডিচ) তৈরি : নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সতর্কতার সাথে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করে লাগসই পদ্ধতিতে তুলনামূলক কম খরচে প্রাকৃতিক প্রজননের ডিচের মত কুচিয়ার বসবাস উপযোগী ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর তৈরি করা যায়।

ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর (ডিচ) নির্মাণ :

একুয়াকালচার পদ্ধতির মত প্রথমে নির্বাচিত উঁচু জায়গায় একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর নির্মাণ করতে হবে। পুকুরের আয়তন ৩০ ফুটx১২ ফুট x৩.৫ ফুট আকারের হতে হবে।

ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) কুলপাড়/বকচরের বাইরের চারদিকে বাঁশের শক্ত খুঁটি পুঁতে বাঁশের ফালি দিয়ে মজবুত করে ২.৫ ফুট উঁচু বেড়া দিতে হবে। ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের একপাশের বেড়া থেকে অপর পাশ পর্যন্ত প্রথমে মাটিতে পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে। তার উপর ত্রিপল বিছিয়ে দিতে হবে।

আবাসস্থল তৈরি

ত্রিপলের উপর ১ম স্তরে ৬ ইঞ্চি পুরুত্বে ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে তলদেশে বিছিয়ে দিতে হবে। ২য় স্তরে চুন, গোবর, কচুরিপানা ও খড়মিশ্রিত কমপোস্ট দিয়ে ৫ ইঞ্চি পুরুত্বের স্তর তৈরি করতে হবে। ৩য় স্তরে ০৭ দিনের শুকনো কলাপাতা দিয়ে ০১ ইঞ্চি পুরু করে ঢেকে দিতে হবে। সর্বশেষ ৪র্থ স্তরটি ৬ ইঞ্চি পুরু হবে এবং এ স্তরে ১ম স্তরের মত ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে।

ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) ভিতরের চারদিকে বেড়া-সংলগ্ন কুলপাড়/বকচরটি ১ ফুট পর্যন্ত চওড়া করে ১ ফুট গভীরতায় ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি মিশিয়ে নির্মাণ করতে হবে।

ত্রিপলের উপর ১ম স্তরে ৬ ইঞ্চি পুরুত্বে ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে তলদেশে বিছিয়ে দিতে হবে।

২য় স্তরে ৩ কেজি ইউরিয়া, ৬ কেজি টিএসপি, ৬ কেজি চুন, ৬০ কেজি গোবর, প্রয়োজনীয় পরিমাণ কচুরিপানা ও খড় দিয়ে স্তরে স্তরে সাজিয়ে কমপোস্ট তৈরি করে ৫ ইঞ্চি পুরুত্বের স্তর তৈরি করতে হবে।

৩য় স্তরে ০৭ দিনের শুকনো কলাপাতা দিয়ে ০১ ইঞ্চি পুরু করে ঢেকে দিতে হবে।

সর্বশেষ ৪র্থ স্তরটি ৬ ইঞ্চি পুরু হবে এবং এ স্তরটি ১ম স্তরের মত ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে।

ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) ভিতরের চারদিকে বেড়া-সংলগ্ন কুলপাড়/বকচরটি ১ ফুট পর্যন্ত চওড়া করে ১ ফুট গভীরতায় ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটির মিশিয়ে নির্মাণ করতে হবে।

চৌবাচ্চার বাহিরের চারদিকে ২.৫ ফুট উঁচু বাঁশের শক্ত খুঁটি পুঁতে বাঁশের ফালি দিয়ে একটি বেড়া দিতে হবে।

আবাসস্থল তৈরিতে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে-

নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং তাপমাত্রা রোধ করার জন্য বকচর/কুলপাড়ের উপর নারিকেল গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

কুলপাড়টি পানির স্তর থেকে সবসময় বেশি উচ্চতায় থাকবে।

পানির স্তর নিচে নেমে গেলে পানি সরবরাহ করতে হবে।

প্রকৃতিতে কুচিয়ার আবাসস্থল ধানখেতের মত ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) পরিবেশ উপযোগী করতে হবে।

কুচিয়া অবমুক্তির পূর্বে ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) আশ্রয়স্থল হিসেবে জলজ আগাছা ও কচুরিপানা দিতে হবে।

ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিস) কূলপাড়ে এরা গর্ত করবে।

পরবর্তীতে এরা গর্তে বসবাস করবে।

কুচিয়ার পোনা মজুদ ও মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদ :

প্রতি বর্গফুট আয়তনের পানিতে গড়ে ১০০ গ্রাম ওজনের ৫-৭টি হারে কুচিয়ার পোনা মজুদ করতে হবে। পোনা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উভয় উৎস হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ডিচটির পরিবেশ পোনা ছাড়ার পূর্বে প্রকৃতির ধানখেতের আবাস্থলের মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কুচিয়ার খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ নির্ভর করে মাছের মোট ওজন ও পরিবেশের তাপমাত্রার ওপর।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা :

ছোট মাছ, মাছের পোনা, গুতুম মাছ, কেঁচো, শামুক, সিল্ক ওয়ার্ম পিইপি, জলজ কীটপতঙ্গ, শুটকি মাছ ইত্যাদি।

কুচিয়া জলজ কীটপতঙ্গ বেশি খেতে পছন্দ করে।

কেঁচো ও ধানখেতের গোল্ডেন এ্যাপেল শামুকও এদের পছন্দের খাবার।

খাদ্য প্রয়োগ

জীবন্ত খাবার- হিসেবে কার্প মাছের রেণু বা ধানি পোনা ১৫ দিন পর পর মজুদ করতে হবে। আবার তেলাপিয়া মাছ মজুদ করা হলে পোনা উৎপাদন করবে যা কুচিয়ার খাবার হিসেবে ব্যবহার হবে।

সম্পূরক খাদ্য- প্রতিদিন শারীরিক ওজনের ৩-৫% সম্পূরক খাবার দিতে হবে। ছোট অবস্থায় কুচিয়া চাষে উচ্চ হারে এবং বড় হলে নিম্ন হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। কুচিয়া মাছ নিশাচর প্রাণী। রাতে খাবার খায়। খাদ্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা ভাল।

ছোট শুটকি মাছ জিআই তার দিয়ে মালাগেঁথে মাছগুলো ২.৫ থেকে ৩.০ ফুট সাইজের প্লাস্টিক পাইপের মধ্যে পেঁচিয়ে তলায় রেখে দিতে হবে। দুদিন পর পর পরীক্ষণ করে দেখতে হবে মাছ কতটুকু খেয়েছে। (৮০-৯০%) খাবার শেষ হলে পূর্বের ন্যায় খাবার দিতে হবে।

জীবিত এ্যাপেল শামুক খাদ্য হিসেবে দিতে হবে।

শামুকের মাংস, সিল্ক ওয়ার্ম পিউপি, কেঁচো ইত্যাদি খাবার অল্প পানিতে ট্রেতে রেখে দিতে হবে।

ফিসমিল ও অন্যান্য আমিষের উৎসের খাদ্য উপকরণ দিয়ে ৪০% আমিষ যুক্ত পিলেট খাদ্য তৈরি করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কুচিয়া এ খাদ্যে অভ্যস্ত হলে পিলেট খাদ্য প্রয়োগ করেই এ-মাছের চাষ করা সম্ভব হবে এবং চাষ সহজ হবে।

আহরণ পদ্ধতি

কুচিয়া আহরণ পদ্ধতি ০৩ ধরনেরঃ

১. বড়শি দিয়ে (Line)

২. কাঁদায় হাত দিয়ে (Physically)

৩. ট্রেপ পদ্ধতি (Bair)

আহরণ প্রক্রিয়া

১ম বছর মোট অবমুক্তের ৭০-৮০%।
২০-৩০% কুচিয়া পরবর্তীবছর বংশবিস্তার করবে এবং
২য় বছরে ৮০% বাজারজাত করতে হবে।

আয়-ব্যয় হিসাব (একুয়াকালচার পদ্ধতি) ঃ

উৎপাদন ও আয় ঃ

- ★ মোট আয়তন = ৩৬০ বর্গফুট।
- ★ বকচর বাদে আয়তন = ২০৮ বর্গফুট।
- ★ অবমুক্ত পোনার সংখ্যা = ১৪৪০ টি (৭ টি / বর্গফুট)।
- ★ মৃত্যু হার (৫%) = ৭২ টি।
- ★ উৎপাদিত মাছের সংখ্যা = ১৩৬৮ টি।
- ★ প্রতিটি মাছের গড় ওজন = ৩৫০ গ্রাম।
- ★ উৎপাদিত মাছের মোট ওজন = (১৩৬৮ * ৩৫০) গ্রাম = ৪৭৮.৮০ কেজি।
- ★ বিক্রয় = (৪৭৮.৮০ * ২৬০) টাকা = ১,২৪,৪৮৮ /- টাকা।
- ★ মোট ব্যয় = ৭৫,০০০ /- টাকা।
- ★ নিট লাভ = ১,২৪,৪৮৮ - ৭৫,০০০ টাকা = ৪৯,৪৮৮ /- টাকা। (১ম বছর)
- ★ নিট লাভ = ১,২৪,৪৮৮ - ৫৫,০০০ টাকা = ৬৯,৪৮৮ /- টাকা। (২য় বছর)

রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে ঃ

- মোট উৎপাদিত মাছ = ৪৭৮.৮০ কেজি।
- বিক্রয় = (৪৭৮.৮০ * ৮০০) টাকা = ৩,৮৩,০৪০ /- টাকা।
- উৎপাদন খরচ = ৭৫,০০০ /- টাকা।
- রপ্তানির জন্য প্যাকিং , বিমান ভাড়াসহ অন্যান্য খরচ = (৪৭৮.৮০ * ২৪০) টাকা =১,১৪,৯১২ /- টাকা।
- মোট খরচ = (৭৫,০০০ + ১,১৪,৯১২) টাকা = ১,৮৯,৯১২ /- টাকা।
- নিট লাভ = (৩,৮৩,০৪০ - ১,৮৯,৯১২) টাকা = ১,৯৩,১২৮ /- টাকা।